তত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি খোলা চিঠি

মোহাম্মেদ দিদারুল আলম, বীর প্রতীক

পুরোনো স্টাইলের ইলেকটিভ ডেমোক্রেসি দেশকে প্রকৃত গণতন্ত্র ও সুশাসন দিতে পারবে না। সেনাবাহিনী প্রধানের সম্প্রতিককালের উপস্থাপিত নিবন্ধের একটি বাক্য। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ধরে নেয়া যায় এটা তত্বাবধায়ক সরকারেরই অনুভব। যদি তাই হয় তাহলে বিকল্প কী? সেনাবহিনী প্রধান বা তত্বাবধায়ক সরকার প্রধান আশা করি যথা সময়ে এ বিষয়ে জাতিকে অবহিত করবেন। নিশ্চয়ই তাঁরা বিকল্পও ভেবেছেন।

পুরোনো স্টাইলের সংসদীয় গনতন্ত্র ৩০০ জন সাংসদ নির্বাচন করেন। তাঁরা আবার একজন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করার প্রহসন করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ৫০/৬০ জন পেয়ারের সাংসদ/অসাংসদকে মন্ত্রী বনান। এটা হলো আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিক্রমা। এ পরিক্রমায় জনগণের অংশিদারিত্ব কোথায়? জনগণ ৩০০ জন প্রতিনিধির ওপর তাদের উন্নয়ন/দেখবাল করার দায় দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন/দিতে বাধ্য হলেন। ৩০০ জন আবার একজনের কাছে সব দায় দায়িত্ব অর্পন করে বাধিত হলেন। এন্ড রেজাল্ট গিয়ে দাড়ালো এক ব্যাক্তির কাছে ১৪ কোটি মানুষের সমর্পণ। একজন ব্যক্তি ১৪ কোটি মানুষের দেখবাল করতে পারে না। এই পরিক্রমায় অসহায় জনগণ ৫ বছর অন্তর অন্তর একটি ভোট দেয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারে না।

তার জমিটা বেহাত হয়ে যাচ্ছে তাৎক্ষনিক প্রতিকার পাওয়ার কোন উপায় নেই। কারো খুন হওয়ার উপক্রম হয়েছে বাঁচাবার কেউ নেই। খুন না হওয়ার আগ পর্যন্ত আইনের কোন কিছু করার নেই। কাজেই খুন হয়ে কেবল আদালতের দোর গোড়ায় যেতে পারবেন। তার আগে নয়। বাড়ি সামনের পুকুরটা হাজামাজা হয়ে পড়ে আছে শরিকানার ঝামেলার কারণে তাতে মাঁছ চাষ করার উপায় নেই। বাড়ি থেকে বের হওয়ার রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে চলাচল করার অনুপযুগি হয়ে পড়ে আছে করার কিছু নেই। বিদ্যূতের খাম্বা বাড়ি পর্যন্ত এসছে কিন্তু বিদ্যূৎ আসে নাই। কখন আসবে তা জানা নেই। ঢাকায় বসে প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রী/এমপি সাহেবেরাই বা কি করবেন? তাঁদের তো হাত পা বাঁধা। নানান নিয়ম কানুনের ফেরে বাঁধা। ইচ্ছে করলেই তো এসব করে দিতে পারেন না। তাছাড়া সময়ের অভাব এত মানুষের কাজ চাইলেই তো সাথে সাথে করা যায় না।

আমরা বলি প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রী/আমলা গংদের এত কস্ট করার দরকার কি? আমার কাজ আমাকে করতে দিলেই তো হয়। কিন্তু পুরোনো স্টাইলের গণতন্ত্র আমার কাজ আমাকে করতে দেবে না। করবেন এমপি সাহেব, মন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রী সাহেব/সাহেবা। আসলে এই সংসদীয় গণতন্ত্রটা হলো সাংসদদের জন্য। তাদের খাওয়া-পড়া/আয় উন্নতির জন্য। জনগণের কাজ হলো তাদের জন্য ভোট দিয়ে যাওয়া। আয় উন্নতির ছিটেফোটা যদি এমপি সাহেব সময় পান তবেই তো দেবেন। ভোটের সময় এলে এমপি সাহেবেরা টাকা পয়সার বস্তা নিয়ে নামবেন। কার কি দরকার খোঁজ খবর নেবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী বস্তার মূখ খুলবেন। দান দক্ষিণা করে যাবেন। সাথে প্রতিজ্ঞা করবেন উন্নয়নের জোয়ারে ভাসিয়ে দেবেন। কার উন্নয়ন সেটা খোলাসা করবেন না। নিজের উন্নয়নেই জনগণকে ভাসিয়ে দেবেন। বোকা জনগণ তো খুশি এমপি সাহেব এত দয়ালু কত দান দক্ষিণা করছেন। এমন লোককেই তো ভোট দিতে হবে। এটাই হলো আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্যারিশমা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের লোকজন এমপি হবেন না এটা আমরা ধরে নিতে পারি। জনগণকে জনগণের কাজ করতে দেবেন সে রকম একটি গণতন্ত্রের বুনিয়াদ রচনা করে যাবেন এই প্রত্যাশাই আমরা করছি। সত্যি বলতে কি আমাদের বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বস্তুত এলিট শ্রেণীর কল্যানেই পরিচালিত হয়ে থাকে। সব বিধি-বিধান এমনকি সংবিধানও এলিট শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে প্রণীত হয়েছে। উপনিবেশিক উত্তরাধিকত্ব রক্ষার কারণেই এমনটা হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনায়/ব্যবস্থায় মৌলিক চিন্তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি। এখনই সম্ভবত উপযুক্ত সময় তা ঘটানোর। আপনাদের চিন্তার পরিপূরক হিসেবে সার্বিকভাবে কল্যানমূখি একটি গণতান্ত্রিক ধারণা আপনার সমীপে পেশ করছি।

তৃণমূল থেকে গণতন্ত্রকে মজবুত করে তুলতে হবে। আপনি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, পুরো বাংলাদেশ মসজিদ-ভিত্তিক অলিখিত একটি পাড়া-প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর দাড়িয়ে আছে। অর্থাৎ যেসব বাড়ির মানুষ যে মসজিদে জুমা/ঈদ/কোরবানির নামাজ পড়ে তারা একটি সমাজ/পাড়াভুক্ত। এক বা একাধিক গোষ্টি এ পাড়ার অন্তরভুক্ত থাকে। তারা একটি সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ। অনেক কলহ বিবাদও তারা শালিসির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে ফেলে। মোট কথা একটি অলিখিত স্থানীয় সরকার এখানে বলবত আছে। গনতন্ত্রকে মজবুত করার জন্য এই অলিখিত সরকারকে লিখিত সরকারে পরিণত করা যেতে পারে। নির্বাচনের মাধ্যমে পাড়া-সরকার গঠন করার কথাই বলছি। এ পাড়া সরকারই তাদের এলাকার জায়গা জমি, পুকুর, জলাশয়, গাছগাছালি, ফলমূল, শাকশব্জি, রাস্তাঘাট, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তিসহ সবকিছুর উন্নয়ন সাধন করবে।

সম্পূর্ণ চেনা-জানা পরিবেশে আপন মানুষদের এ নির্বাচনে খারাপ মানুষের নেতা হওয়ার কোন সুযোগ নেই। হলেও তা তারা অতি সহজেই সংশোধন করে নিতে পারবে। এ নির্বাচনে কোন ব্যালট বাক্সের প্রয়োজন নেই। এক পয়সা খরচেরও কোন বালাই নেই। মসজিদ প্রাঙ্গনে বসে তারা এ নির্বাচন মৌখিক/হাত তোলা ভোটিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে পারবে। এ পাড়া সরকারই হবে জাতীয় সরকারের ভিত। পাড়ার পরে হতে পারে গ্রাম সরকার ১০টি পাড়াকে নিয়ে। অতপর জনপদ সরকার। আঞ্চলিক সরকার। প্রাদেশিক সরকার। জাতীয় সরকার। ১০টি পাড়া সরকারই নির্বাচিত করবে একটি গ্রাম সরকার। পাড়া সরকার ও গ্রাম সরকার যৌথভাবে নির্বাচন করবে জনপদ সরকার। এভাবে ক্রম উর্ধগতিতে জাতীয় সরকারও নির্বাচিত হবে। এ পদ্ধতিতে ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রকরণ ঘটবে। তৃণমূল স্তরের মানুষও সরকার পরিচালনার অংশিদার হবে। উপনিবেশিক কাঠমোর শক্তিশালী আমলাতন্ত্র বিলুপ্ত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হবে।

জাতীয় সংসদের কর্মকান্ড হবে কেবল আইন প্রণয়ন ও নীতি নিদ্ধারণী কাজে সীমাবদ্ধ। সংসদে সকল পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। সেনাবাহিনী, পুলিশ, সিভিল সার্ভিস, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কৃষিবিদ, ব্যাংকার, শ্রমিক, ব্যবসায়ীসহ সকল পেশার নির্বাচিত/মনোনিত প্রতিনিধি থাকবে। এছাড়া প্রতি অঞ্চল/প্রদেশ থেকে থাকবে ভারসাম্যমূলক প্রতিনিধি।

উপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থার মূল উৎপাটনের লক্ষ্যে সব পেশার নিজ নিজ বিচার ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সেনাবাহিনীতে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার আদলে সকল পেশার নিজ নিজ বিচার ব্যবস্থা চালু করলে বিচার কাজে গতিশীলতা আসবে। পাড়া স্তরের বিচার পাড়া সরকারই সমাধা করবে। এর উপরের স্তরের সরকারগুলোর সাথে একটি করে স্থায়ী আদালত থাকবে। তারা কেবল আপীলের শুনানী করবে। দুই স্তরে আপীলের রায় একই থাকলে আর আপীলের সুযোগ থাকবে না। বাদি/বিবাদির নিজে নিজ পক্ষে বক্তব্য/যুক্তি তর্ক পেশ করার সুযোগ থাকবে। পেশাজীবি উকিল নিয়োগ না করে তার পছন্দমত কোন

ব্যক্তিকে তার পক্ষে বক্তব্য পেশ করার জন্যও নিয়োগ করতে পারবে। এ ধরণের বিচার ব্যবস্থা উপনিবেশিক উকিল-টাউটদের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করবে।

জাতীয় সর্বোচ্চ আদালত তথা সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে অবসরপ্রাপ্ত পেশাজীবিদের দ্বারা। পেশার সর্বোচ্চ স্তর থেকে যাঁরা সুনামের সাথে অবসর নিয়েছেন তাঁদের মাঝ থেকে জাতীয় সরকার নিয়োগ দেবে সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টকে জাতীয় বিবেক হিসেবে গণ্য করা হবে। কেবল আইনের দৃষ্টিকোন থেকে নয় বিবেক ও সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে তাঁরা বিচার কাজ সমাধা করবেন/রায় দেবেন।

রাজস্ব আদায় নিয়েই সবচেয়ে বড় ধরনের দূর্নীতি আমাদের দেশে হয়ে থাকে। সেটার জন্যও দায়ী উপনিবেশিক কর ব্যবস্থা। মানুষ কর দিতে চায় না। না চাওয়ারও কিছু সংগত কারণ আছে। প্রথমত কর কর্মকর্তারাই নিরুৎসাহিত করে কর না দেয়ার জন্য। কর ফাঁকি দেয়ার কলা কৌশল তারাই করদাতাদের শিখিয়ে দিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত উপনিবেশিক আমলে "পরায়া সরকারকে কর দেব কেন?" এ মানসিকতা থেকে মানূষ কর ফাঁকি দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর "লুটেরা সরকারকে কর দেব কেন?" এ মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এখন লুটেরা সরকার নেই। কাজেই কর আদায়ে নতুন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। জনগণকে আশ্বস্ত করতে হবে তাদের করের টাকা আর লুটপাট হবে না। সবটাই জনগণের কল্যানেই খরচ হবে। বর্তমান সরকার এটা জোর দিয়ে বললে জনগণ বিশ্বাস করবে।

ব্যবসায়ীর লাভ রোকসানের হিসেবের জটিলতায় না গিয়ে টার্ণওভার ট্যাক্স পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। হিসেবের এ জটিলতাই কর কর্মকর্তা/ব্যবসায়ীদের দূনীতি করার সুযোগ করে দেয়। মাসে/ বছরে যে যত টাকার পণ্য/সেবা বিক্রয় করবে তার ১-৩% স্ব-নিদ্ধারণি পদ্ধতিতে সরকারের কোষগারে জমা করবে। আমদানি রফতানির ক্ষেত্রেও যত টাকার এলসি খুলেছেন তত টাকার ৫/১০% বা পণ্যভেদে নিদ্ধারিত হারে এলসি খোলার সময়ই কর দিয়ে দেবেন। তাহলে ব্যবসায়ীকে পণ্য খালাস করার সময় কর কর্মকর্তাদের কর নিদ্ধারণী জুজুর শিকার হতে হবে না। কেবল এলসিতে উল্লেখিত পণ্য আমদানি/রফতানি হয়েছে কিনা সেটা দেখাই হবে তাদের কাজ। আসলে সব কাজগুলোই বিশ্বাসের ভিত্তি দিয়েই শুরু করতে হবে। বিশ্বাস ভঙ্গ করলে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে সময়েই সব ঠিক হয়ে যাবে।

এছাড়া যিনিই আয় করেন তিনিই কর দেবেন। এই নীতি চালু করতে হবে। রাষ্ট্রের প্রায় ৯০-৯৫% মানুষ কোন প্রকার কর দেয় না। ৫-১০% লোকের দেয়া করের ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রকে চলতে হয়। আমরা বাংলাদেশের সীমানায় বাস করছি। কম হোক বেশি হোক প্রত্যেকে কোন না কোন প্রকারে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর সুবিধা ভোগ করছি এবং আয় করছি। সরকারের যেমন তার নাগরিকের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তেমনি নাগরিকেরও সরকার তথা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে।

একটা দেশের নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী কোন না কোন প্রকারে কর দেয়া উচিত। এটা নাগরিক হিসাবে তার অস্তিত্ব এবং অধিকার প্রতিষ্টার জন্যই একান্ত প্রয়োজন। কর না দিলে রাষ্ট্রের কাছে তার অধিকারের ভিত্তি সৃষ্টি হয় না। লেনদেন না থাকলে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, ক্রেতা-বিক্রেতায়, এমন কি পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যেও সম্পর্কের গভীরতা সৃষ্টি হয় না। একের মধ্যে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধের অনুভব জন্মায় না। তেমনি রাষ্ট্র ও তার নাগরিকের মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক না থাকলে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অনুভব সৃষ্টি হয় না।

এ অনুভব সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার সকল উপার্জনশীল নাগরিকের জন্য স্ব-নিদ্ধারণি পদ্ধতিতে একটি কর প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারে। প্রত্যক উপার্জণশীল নাগরিক, কর দেন বা না দেন, নিজ নিজ আয়ের ১-৩% (নিম্ম আয়ে ১, মধ্যম আয়ে ২ ও উচ্চ আয়ে ৩%) বেসিক নাগরিকত্ব কর হিসেবে সরকারকে প্রদান করবেন। কর কর্মকর্তাদের কোন প্রকার খবরদারি/নজরদারি করার প্রয়োজন নেই। সরকার কেবল এই

মর্মে একটি নীতি ঘোষণা করবে। বারবার জনগণকে স্বরণ করিয়ে দেবে কেন এই কর দেয়া প্রয়োজন। জনগণ স্ব-ইচ্ছায় মাস শেষে পরবর্তী মাসের যে কোন দিন এ কর যে কোন ব্যাংকে জমা দেবে। ব্যাংকগুলোর জন্য এ কর গ্রহন করার বাধ্য বাধকতা থাকবে। ফলাফল দেখার জন্য সরকার এক বছর অপেক্ষা করবে। এক বছর পর গণ-শুনানীর মাধ্যমে কর নীতির প্রয়োজনীয় সংশোধন করবে এবং প্রয়োজনে কিছুটা বাধ্য বাধকতা আরোপ করবে।

সচেতনতার অভাবে স্বত প্রবৃত্ত হয়ে মানুষ তার জন্য ভাল কাজটি সব সময়ে করতে পারে না। কিছুটা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সে কাজটি তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। চাপে তাপ সৃষ্টি হয়। চাপ পড়লে অসচেতন মানুষও সচেতন হয়ে ওঠে। কর নেয়া একটি চাপ। রাষ্ট্রের পক্ষে থেকে এ চাপ তার নাগরিকের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তাপ সৃষ্টি করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মোহাম্মেদ দিদারুল আলম, বীর প্রতীক
প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা, লেখক ও প্রাবন্ধিক
বাড়ি ৬৫এ, রোড ১৫এ, ধানমন্ডি আ/এ
ফোনঃ ৯১৪৩৫৪৮/ ০১৯১১৯৩৭৬৬২